ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 267-273
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.032

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আখ্যানের বিনির্মাণ

ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন, *সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান বাংলা বিভাগ, সামসি কলেজ, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ*

Received: 13.11.2024; Accepted: 28.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Manik Bandopadhyay's approach to narrative construction and deconstruction in his short stories represents a pivotal shift in Bengali literature. Through his unique technique of reconstructing the narrative, he embeds a deeper message aimed at challenging contemporary societal norms and addressing the complexities of human existence. Drawing from Jacques Derrida's post-structuralist theories, Bandopadhyay's work explores how power structures manifest within texts and society. His stories often break away from traditional storytelling by focusing on the psychological depth of characters, examining their internal conflicts in response to external societal pressures. Incorporating Freudian psychoanalytic theories, Bandopadhyay explores themes of human desire, particularly sexuality, and its potential to instigate social change. In contrast to many of his contemporaries, Bandopadhyay boldly addresses topics of sexual revolution and societal transformation, demonstrating how personal desires can challenge conventional social norms. His works serve as both a reflection and critique of the period's social fabric, offering new ways to interpret human experiences and the possibility for societal change. Through innovative narrative techniques, Manik Bandopadhyay not only created compelling stories but also provided a platform for rethinking traditional values, marking a significant contribution to the evolution of Bengali literature.

Key Words: Manik Bandopadhyay, Narrative Construction, Deconstruction, Post-structuralism, Jacques Derrida, Contemporary Literature.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে আখ্যানকে কিভাবে বিনির্মাণ করেছেন; কিংবা বলা ভালো বিনির্মাণের মধ্যদিয়ে সমকালীন পাঠকবর্গকে কি বার্তা দিতে চাইলেন, তা তাঁর ছোটগল্পর পটভূমি লক্ষ্য করলেই সেই তত্ত্বকথা পরিষ্কার। সংস্কৃতে 'আখ্যান' শব্দটির অর্থ বেশ ঘোরালো। তবে আখ্যান বলতে এমনিতেই বোঝায়-কাহিনি, যার মধ্যে থাকে ঘটনাপ্রবাহ, চরিত্রচিত্রণ। বিনির্মাণবাদী তাত্ত্বিক জ্যাক দেরিদার বিখ্যাত সুত্র হল পাঠ কৃতির বাইরে কোন প্রসঙ্গ নয়, বা থাকেনা। অর্থাৎ যা কিছু ঘটনার ঘটমান তা থাকে আসল পাঠের মধ্যেই। আর এই খানেই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে পাঠের বিনির্মাণ। আসলে বিনির্মাণ শেখায় জ্ঞান ও প্রতাপের কৃৎ কৌশল। যা প্রতিটি স্তরে বিরাজমান প্রতাপের আধিপত্যতা। কিভাবে সামাজিক স্তরে তাঁর দাপট বা শক্তি প্রদর্শন করে, তার দিকেই ইঙ্গিত করে বিনির্মাণবাদ। বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম

প্রাণপুরুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে সামাজিক পিছুটান বাস্তবতা, অন্যদিকে নবচেতনার জোয়ার এই দুই দ্বান্দ্বিক সমন্বয় সম্মুখীন পরিসরে অবচেতন মনন নিয়ে মানবিক অস্তিত্বের সন্ধানে নতুন ভাবে বেঁচে থাকার রসদ দিলেন-ছোটোগল্পে। তাই তাঁর গল্পপটভূমির পরিসর হয়ে ওঠে; লুকিয়ে থাকা জীবন মননের বিচিত্রতা। মানিক ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে তাঁর গল্পে নতুনভাবে বিনির্মাণ করলেন। যা বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন বাঁক বা মোড় বলা যেতে পারে। সমকালীন অন্যান্য গল্পকার বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও, মানিক সেটা করেননি। যৌনতার মধ্যে যে বিপ্লব, সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে সেটা তিনি চাক্ষুষ প্রমাণ করে দিলেন।

বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত শিল্পীব্যক্তিত্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৯২৮ সালে 'অতসীমামী' ছোটগল্পের মাধ্যমে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন দুই সমালোচক অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন- 'কল্লোলেরই কুলবর্ধন' আর বুদ্ধদেব বসুর মতে- be lated kalloean. কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের প্রেক্ষিত ও পরিসরে মানিকের সাহিত্য নতুন করে আলোচনার দাবী রাখে। কারণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, সামাজিক পরিসরে ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিকসত্তার দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত মানিক। অস্তিত্বের সংকট, নৈরাশ্যতা, হতাশা, ও একাকীত্ব ব্যক্তি মানিক কে অন্য এক বাস্তবতার জগত চিনিয়ে দেয়। এখানেই তিনি ফ্রয়েডিয় চিন্তা ধারার সাথে নিজেকে মিলিয়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম সেরা অক্ষরশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ শতকের তিরিশের দশকে যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করছেন সে-সময় 'মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর / যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল'। সে ছিল এমন এক সময় যখন মানুষের মূল্যবোধ আদর্শ সমূহ বিনষ্টির পথে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই তাঁর লেখায় কাহিনির রঙিন জগৎ অনুপস্থিত। আর তাই সে- সময়ের বহু নক্ষত্রখচিত বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে তাঁর উপস্থিতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বলা চলে, বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন, যার–

> "মূলে আছে তার বাস্তব দৃষ্টি, যা সমাজ ও ব্যক্তির সমস্যার গভীরে অনায়াসে পৌছে যায়।"[১]

আর মানিকের নিজের ভাষায়- 'জীবনকে যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ভগ্নাংশ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি।' মানুষের মন পৃথিবীর বিচিত্রতম-জটিলতম এক ধাঁধা। আচরণের সঙ্গে অনেক সময়ই তার মনোভাব মেলে না, আবার ইচ্ছার সঙ্গে কার্য। যে-কোনো বহিরঙ্গ সমস্যাও মানুষের অন্তর্জগতে আলোড়ন তুলতে পারে আবার কোনো অন্তর্গূঢ় সংকটও প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে বহির্জগতের কার্যানুষঙ্গে। মানুষের এই বৈচিত্র্যের কারণ অন্বেষণ মানিক করে গেছেন বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায়-

> 'বিপুল বিপর্যয়ের মুহূর্তেও জীবনের নতুন সূচনার সম্ভাবনা দ্যোতিত হয়ে যায়, হতে পারে। আবার প্রাপ্তির মুহূর্তেও ব্যাখ্যাতীত অপ্রাপ্তির বোধ কোনও মানুষকে গ্রিক প্রত্নকথার বিখ্যাত চরিত্র সিসিফাসের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে।"[২]

তাই তার ৪৮- বছর জীবনের ২৮ বছর সাহিত্যচর্চা কালের মধ্যে লিখিত ৩৫টি উপন্যাস ও সংকলিত অ-সংকলিত প্রায় ২৫০ টি গল্পের মাধ্যমে মানিক অনুসন্ধান করে গেছেন: কাকে বলে মানুষ? মধ্যবিত্ত সুলভ উন্নাসিকতায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে তিনি নিচুতলার দরিদ্র জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, তাদের জীবনকে দেখেছেন পাশ থেকে। দেখেছেন মধ্যবিত্তের ভন্ডামি, ন্যাকামি, গরীবদের প্রতি অবিচার। তার নিজের ভাষায়-

> "ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে। উভয়স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরালো করে তুলত।

ভদ্রজীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটিয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকার, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মানুষের দারিদ্র্য পীড়িত জীবনে । ... ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভন্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার-অনাচার, বিকারগ্রস্ততা, সংস্কারপ্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে, ভদ্রজীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ ? ভদ্রসমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী মজুর, মাঝি-মাল্লা, হাড়ি-বাগদীদের, রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এ বিরাট মানবতা-- যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে-সাহিত্যে স্থান পায় না?"[৩]

সাহিত্যের এই অভাব মেটাতে মানব-প্রেমিক, জীবন-প্রেমিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করে গেছেন। পরবর্তীকালে মার্কসীয় সাম্যবাদী দর্শন তাকে অনুপ্রাণিত করে এই অবিচারের বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদ তুলে ধরতে । আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগী চোখের স্বপ্ন' নিবন্ধে লিখেছেন –

"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল মনোবিকলনে সফল রূপকার নন। মানুষের ভান ও সমাজ ব্যবস্থাকে ধিক্কার দিয়েই তিনি দায়িত্ব পালনের তৃপ্তি অনুভব করেননি। যে-কোনো মাপে বড় শিল্পী বলে তিনি মানুষের ও সমাজের প্রকৃত বিশ্লেষণের কর্তব্য স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে তুলে নেন। এবং আর একটু এগিয়ে এই অসহনীয় অবস্থানটি পালটে দেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন ।"[৪]

মানিকের বহুচর্চিত ও বিখ্যাত গল্পগুলি হলো 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'শিল্পী', 'টিকটিকি', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' ও 'দুঃশাসনীয়' প্রভৃতি। কিন্তু এগুলি ছাড়া অন্যান্য গৌন গল্পগুলিতেও তার বাস্তব দৃষ্টির অসাধারণত্ব, তার মানব-প্রেম, তার সমাজ-বিশ্লেষণ ও মনোবিশ্লেষণের সক্ষমতা সমানভাবে বর্তমান।

লেখক জীবনের একদম প্রারম্ভিক কয়েকটি গল্পে শরৎচন্দ্রের সামান্য প্রভাব নজরে পড়লেও, পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রীয় নির্ভেজাল সারল্য ও সম্পর্কের মাধুর্য মানিকের গল্প থেকে অন্তর্নিহিত হয়। যে-কোনো আপাত-করুণ মধুর ঘটনাকেও মানিক আত্মস্থ করেন মনোবিশ্লেষণের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে। 'যাত্রা' গল্পের প্রধান ঘটনা বিবাহের পর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। কিন্তু এই ঘটনাকে সামনে রেখে লেখক বর্ণনা করেছেন মানবমনের বিচিত্রগতি, এসেছে বাঙালি পরিবারে নারীর পরিসর। নববধু ইন্দুর বন্ধু ক্ষেন্তির বর্ণনায় আসে বিবাহোত্তর একটি মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান-

"ক্ষেন্তি বলিল, হাসিস্ কি লো? ও বাড়ির পুষি বেড়ালটার পর্যন্ত যখন মন যুগিয়ে চলতে হবে তখন টের পাবি।"[৫]

আর মেয়ের বিয়ে ? সে যে বরপণ, বিবাহের আয়োজন ইত্যাদির পর-

"মেয়ের শুভবিবাহে শুভ, যে কাহার হইল তাহাই ভাবনার বিষয়"[৬]

বলে মনে হয় মেয়ের বাবার। গল্পটির প্রাসঙ্গিকতা বোধ করি আজকের সমাজেও বিন্দুমাত্র কম হয়নি। হয়তো এখন মূর্ছার ব্যারাম আছে বলেই পুত্রবধূকে ত্যাগ না করে ত্রিশ হাজার টাকায় রফা করে বরের বাবা প্রমাণ করেন যে তারা পাষণ্ড নন। এখানেই সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বচক্ষে দেখালেন পিতৃতন্ত্র প্রতাপ দ্বারা বেষ্টিত সমাজব্যবস্থায় নারীর অবদমিত আখ্যান। কিভাবে কূটাভাস দ্বারা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছেন এবং নিজেই আবার বিরোধিতা করেছেন সেই বাস্তব চিত্র।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিলতার উন্মোচনে তাঁকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি তাঁকে প্ররোচিত করেছে জীবনের বিভিন্ন বঙ্কিম ও রূঢ় অভিজ্ঞতাগুলিকে বিশ্লেষণে ও নানা অসংগতির সূত্র

নির্ণয়ে সচেষ্ট হতে। আসলে মানুষ যতই উন্নতি করুক, যতই সভ্য হোক না কেন সে প্রাকৃতিক জীবই তো-- ফলে আদিম প্রবৃত্তিগুলো সবই আজও বহন করে চলেছে। তার আচরণের মূলেও থাকে ক্ষুধা ও কাম প্রবৃত্তি–

> "বাইরের দিক থেকে চরিত্রগুলির আচরণ যেভাবেই ব্যাখ্যা করা যাক না কেন, তাদের অন্তর্নিহিত চালিকা শক্তি যে এ ক্ষুধা ও অবচেতন মনের যৌন অনুভূতি, অবদমিত কাম"[৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের পটভূমি তেভাগা কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিত হলেও, গল্পের আখ্যানে যৌনতার আকর্ষণ চিত্র একেবারে এড়িয়ে যাইনা পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর অসাধারন ছোটগল্প- 'হারানের নাতজামাই' তাঁর দৃষ্টান্ত। ভুবনকে ধরার জন্য কতনা ফন্দি করেছে মন্মথ, তাই সে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হাসখালি গ্রামে হারানের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। সেই ঘরেই ভুবন লুকিয়ে রয়েছে এরকম সংবাদ মন্মথ পেয়েছে। তাই হারানের গৃহে জোর করে প্রবেশ করতে চাই। কিন্তু ময়নার মার কৌশলে ভুবন রক্ষা পেলেও মন্মথর চারিত্রিক দিক মানিক প্রকাশ করলেন এই ভাবে-

> "ময়নার রঙিন শাড়িও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মতো চোখে এঁটে যেতে চায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষি মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা।"[৮]

শুধু তাই নয়, মেয়েটি মন্মথের কাছে বিদেশী শ্যাম্পন । তাই তাঁর মনে–

> "যে যোয়ান মর্দ মাঝ বয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেরই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ।"[৯]

এখানে গল্পকার মন্মথর দ্বারা সামাজিক পরিসরে যে ইঙ্গিত দিলেন তা সামাজিক ক্ষেত্রে অশ্লীল বলে মনে হবে; কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে একে অশ্লীল বলা যাবেনা। এই যৌনতার মধ্যদিয়েই ভুবনের মতো বিদ্রোহী সত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই পট নির্মাণ আবশ্যিক ছিল। আর তাই সচেতন ভাবে তিনি এই দৃশ্য অঙ্কিত করেছেন। 'কেন লিখি' প্রবন্ধে মানিক জানিয়েছেন-

> "লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে সব কথা জানানো যায় না, সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি।"[১০]

অর্থাৎ সেই অজানা কথাই যা আখ্যানের মধ্যে রয়েছে তা বিনির্মাণের দাবী রাখে। এই কারণেই তাঁর ছোটগল্পর পাঠ বিনির্মাণ করা আবশ্যিক। এরকম আরেকটি চিত্র, গ্রাম-বাংলার আকশ বাতাস কম্পিত, নারীর আত্মসম্মানের লড়াই, পুঁজিবাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই- নিয়ে রচিত- 'দুঃশাসনীয়' গল্প। গল্পের পটভূমি নির্মিত বস্ত্রকে কেন্দ্র করে। দুষ্টের শাসনরা কিভাবে বস্ত্র হরণ করে সমাজকে বস্ত্রহীন করে তুলেছে সেই ছবিই এই গল্পের আখান। পুঁজিবাদ গ্রামকে কিভাবে গ্রাস করেছিল তাঁর প্রমাণ এই গল্পের চরিত্র রাবেয়া। যার সঙ্গে জীবন কাটাবে বলে এসেছিল তারই বিরুদ্ধে একরাশ হতাশার ক্ষোভ নিয়ে জলের তলায় শান্তির নীড় করে বসল। এই লড়াই আনোয়ারের বিরুদ্ধে নয়, এই লড়াই পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপের বিরুদ্ধে।

এই সত্যটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাহিত্যে কখনো ঐতিহ্যের নৈতিকতার দোহাই দিয়ে আড়াল করতে চাননি। মনোবিকার ও যৌন বিকারে বিষাক্ত জীবনের ছবি তিনি তাঁর অনেকগুলি গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'আশ্রয়' তার এ রকমের গল্পগুলির একটি। 'ত্রিশ বছরের জোয়ান' বঙ্কু একই দিনে স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছে। কাজ করতে আসে দত্তবাড়িতে, একদিনের জন্য। কিন্তু মালিককন্যা নন্দরানীর উপস্থিতি তার মনে অদ্ভূত ক্রিয়া করে। নন্দরানীর বমি করা দেখে সে ভাবে-

> "জ্বর হয়ে তার বৌ একদিন এমনিভাবে বমি করেছিল।কিন্তু এ তো তার বৌ নয়, এ এমনিভাবে বমি করে কেন?"[১১]

বঙ্কু কম মাইনে, খাওয়ার কষ্ট, গালাগাল সব সহ্য করেও সে বাড়িতে টিকে গেল নন্দরানীর প্রতি তার অদ্ভূত আকর্ষণে। ধীরে ধীরে তার বুদ্ধির জড়তা কাটতে লাগল-

"কাজটা প্রকৃতির, কিন্তু তাতে নন্দরানীর অজ্ঞাত প্রভাব কি একটুও ছিল না? অবশ্য চাকরের বুদ্ধির জট খুলবার ধৈর্য্য ও ইচ্ছা নন্দরানীর থাকার কথা নয়।বঙ্কু সে পছন্দ করত শুধু এই জন্য যে, বঙ্কু নিজেকে বাড়ির মধ্যে বিশেষ করে তারই চাকর করে রেখেছিব।"[১২]

বঙ্কু বুদ্ধির জড়তাটুকু কেটে যাওয়ার পর বঙ্কু নিজের ভালোমন্দ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল, তার নন্দরানীর প্রতি নির্ভরতা কমে গেল। একদিন ঝগড়া করে সে কাজও ছাড়ল কিন্ত পরদিন সকালে সে আবার এসে হাজির, এমনকি মাইনের প্রত্যাশাও সে রাখে না, কেবল চায় নন্দরানীর সাহচর্য নন্দরানীর বিয়ে হয়ে গেলে সে সেখানেও গিয়ে হাজির, খেটে যায় বিনা মাইনেতে। সেই আগের মতোই বঙ্কু নির্ভর করে নন্দরানীর উপর। দেখতে দেখতে সময় বয়ে যায়। নন্দরানী-

"নিজের মোটা শরীরটার দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।
গড়ানো চাকা গড়িয়েই চলবে অবশ্য, কিন্তু তবু ভয় করে!
চুল পাকতে দাঁত পড়তে আর বাকী কত!
বঙ্কু কিন্তু চুলও পেকেছে, দাঁতও পড়ে গেছে কয়েকটা।"[১৩]

এই প্লটকে কেন্দ্র করেই একটা বেশ প্রেমের স্যাতস্যাতে করুণ গল্প লেখা হয়তো যেতে পারত কিন্তু মানিক সেই চেষ্টা বিন্দুমাত্রও করেননি। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন জৈবিক প্রাণীর- বাংলা কথাসাহিত্যের ঐতিহ্যানুসরণে যে কেবল হৃদয়-সর্বস্ব নয়। মানিক যে-সময়ের লেখক সে-সময় যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত গ্রাম বাংলা। অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত, বস্ত্রসংকট ও খাদ্য-সমস্যায় নাজেহাল গ্রাম বাংলার নিঃস্ব-রিক্ত মৃতপ্রায় চেহারা মানিকের কয়েকটি গল্পে অসাধারণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে পড়া যেতে পারে 'নমুনা' গল্পটিকে। অন্নাভাবে মৃতপ্রায় একটি পরিবার খাদ্য সংগ্রহ করে মেয়ের বিনিময়ে। শৈলের বাবা কেশব সব বুঝতে পেরেও নিজের মানসিক শান্তির জন্য মেয়ে কেনাবেচার দালাল কালাচাঁদের হাতে কন্যাদান করে। যারা নিজেদের সুবিধার জন্য এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে, যারা অগুনতি মানুষের মৃত্যু, তাদের ক্ষুধা, তাদের অসহায়তা নিয়ে ব্যবসা করছে, কালাচাঁদ তাদেরই একজন। সে গ্রামের মানুষদের দারিদ্রকে পুঁজি করে ব্যবসা ফাঁদে নারীদেহের –

"রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্যন্ত ধার্মিক বিভীষণ বরাবর যে-দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতেই মেয়েদের দেখে থাকে।"[১৪]

মৃত 'দাদার দু'নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটিকে' সঙ্গে নিয়ে বেশ জমিয়ে চালাচ্ছে তার ব্যবসা। শৈলির জন্য টোপ ফেলা তার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্যেই। কিন্তু আজন্ম লালিত সংস্কার-

"গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুল পাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদব্রাম্মণের মন্ত্রোচ্চারণ"[১৫]

তাকে খানিকটা কাবু করে দেয়। শৈলিকে বাড়ি নিয়ে যাবার কথা ভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোভ তার মূল্যবোধ নৈতিকতাকে ঢেকে দেয়। শৈলির ঘরে 'লোক আছে' শুনে তার 'মাথায় যেন আগুন ধরে' কিন্তু মন্দোদরীর বাড়িয়ে দেওয়া নোটের বান্ডিল নিয়ে গুণতে গুনতে- "মনে হল সে মন্ত্র-বলে ঠান্ডা হয়ে গেছে।"[১৬] যুদ্ধ-পরবতী বাংলা তথা সমগ্র ভারতে যে চুড়ান্ত মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটে এ যেন তারও ছবি। পিতা জেনে বুঝে সন্তানকে বিক্রি করছে, স্বামী বিক্রি করছে স্ত্রীকে। সবই পণ্য। জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম সামগ্রীর জন্য আবার কখনো স্রেফ লোভে ।

বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নৈতিকতা,আশা, স্বপ্ন এসবের ভেঙে যাওয়া মানুষকে অস্থির করে তুলেছে। মন যেন কোথাও বসতে চায় না; কোনো কাজে, কোনো জায়গায় কোনো ভাবেই যেন তৃপ্তি আসে না। এই অতৃপ্তি বোধের প্রতীক যেন 'লেভেল ক্রসিং' গল্পের নায়ক কেশব। সে ড্রাইভার শহরের, তার বাড়ি শহরতলিতে৷ বাড়িতে তার একান্ত আপন বলার মতো কেউ. নেই। তবু সে পায়ে হাঁটার কষ্টটুকু স্বীকার করে মালিকের

বাড়ির সুখাদ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে থাকার আরামটুকু ছেড়ে রোজ শহরতলির ঘরে যায় রাত কাটাতে । রাত্রে শহরে থাকতে সে অস্বস্তিবোধ করে-

> "সেও এই ধোঁকাবাজিতে বিশ্বাস করে- সভ্য জগতের সভ্য জীবনের কোলাহল থেকে দূরে পালিয়ে শান্তি ও স্নিগ্ধতা খোঁজার ধোঁকাবাজিতে ।"[১৭]

সকাল হয়, শহরতলিতে রাত কাটানোর মোহটুকু কেটে যায়, কেটে যায় মায়ার আকর্ষণ-

> "সে অনুভব করে ভিতরে কি যেন প্রচন্ডভাবে চাপ দিচ্ছে, মনে হচ্ছে পাগলের মতো ছুটে চলে যায় লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে শহরের দিকে ।"[১৮]

শহরের কর্মব্যস্ততা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে বসে দূর থেকে ভেসে আসা ললনার গানের সুর তাকে টানতে থাকে।-

> "মায়ার গায়ে পড়া দরদ তার কাছে বিস্বাদ ঠেকে। কিন্তু রাত হলেই তাকে আবার ঠেলবে শহর ফিরে যাওয়ার জন্য শহরতলিতে- সেখানকার শান্ত নিরুত্তেজ জীবন, ল্যাম্পের আলো-আঁধারিতে মায়ার অদ্ভত রকম শান্ত আর মিষ্টি হাসি"[১৯]

তাকে টানবে। এই অস্থিরতাটুকু বোধকরি আধুনিকতার দান। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শশীর কথা যে শহরে প্রবাসী গ্রামে আগন্তুক । অবশ্যই শশী ও কেশবের সমস্যা বা মানসিক এই টানাপোড়েন এক নয় কিন্তু কোথাও যেন সংলগ্নতা থেকে যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সময়ের দলিলীকরণ করতে চেয়েছিলেন তার লেখালেখিতে। আর চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি তুলে এনেছেন বিভিন্ন চরিত্র যাদের অবস্থিতি সমাজের বিভিন্ন পরিসরে। মানিক গ্রাম-জীবন কেন্দ্রিক গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন শহরের মজদুরদের নিয়ে, যেমন লিখেছেন মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গল্প, তেমনি রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ গল্পও লিখেছেন। পুনরুক্তির দোষটুকু স্বীকার করে নিয়েও মানিক তার সারাজীবনের লেখালেখির মধ্যে কখনও মার্কস আবার কখনও ফ্রয়েডীয় দর্শনের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করে গেছেন একাধারে উন্নত, বুদ্ধিসম্পন্ন জটিল ও জৈবিক মানুষকে।

তথ্যসুত্র:

১. মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার, মধ্যাহ্ন থেকে সায়হ্নে: বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, দেজ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০২, পৃষ্ঠা: ৯৬

২. ভট্টাচার্য তপোধীর, উপন্যাসের সময় এবং মুশায়েরা, জানুয়ারী-১৯৯৯ বইমেলা-কলকাতা, পৃষ্ঠা: ২৩৪

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১১ খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ -২০১১, পৃষ্ঠা- ২৯৬

৪. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, প্রবন্ধ সমগ্র, পৃষ্ঠা -১১২

৫. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, ২য় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তৃতীয় সংস্করণ- ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১৮৬

৬. তদেব: ১৯১

৭. মুখোপাধ্যায় কমল, শিলিন্দ্র- শারদীয়া ১৪১৪, পৃষ্ঠা: ১৯৮

৮. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ৬ খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১৬০

৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬০

১০. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১১ খন্ড, প্রথম সংস্করণ: ২০০১, পৃষ্ঠা: ১৫০
১১. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২য় খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ: ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৩৫৯
১২. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৬৩
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৬৪
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পঞ্চম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১৭৯
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮০
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮৪
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ৯ম খন্ড, প্রথম সংস্করণ: ২০০১, পৃষ্ঠা: ৩৬
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ৪০
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ৪০